প্রথম খণ্ড
দ্বিতীয় অধ্যায়

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ ২৭

অর্জুনকে ভর্ৎসনা ২৮
শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের পূর্ণ আত্মসমর্পণ ২৯
জীব নিত্য, জড় দেহ নশ্বর ৩০
আত্মার দেহান্তর ৩১
দেহ ও আত্মার পার্থক্য ৩২
আত্মার দেহ-রূপ পোশাক পরিবর্তন ৩৩
আত্মার নিত্যতা ৩৫
দেহের জন্য শোক করা নিরর্থক ৩৭
যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ৩৮
ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ ৩৯
দিব্যজ্ঞান লাভ, পূর্ণ মোহমুক্তি ৪১
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ ৪২
জড় জগতে পতনের ক্রম ৪৩
ভক্তিযোগীর গতি ৪৪
ইন্দ্রিয় ভোগী অশান্ত, সংযমী শান্ত ৪৫
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি জড়-আসক্তি হতে মুক্ত ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ

সংক্ষিপ্তসার

আসন্ন স্বজনবধের চিন্তায় অত্যন্ত বিষাদমগ্ন হয়ে অর্জুন যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মোহগ্রস্ত না হয়ে, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। কিন্তু অর্জুন শোকে বিমূঢ় হয়ে কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সার্বিক পথ নির্দেশের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করলেন। অর্জুনকে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেহ ও আত্মার পার্থক্য বোঝালেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, প্রতিটি জীবের জড় দেহ নিয়ত পরিবর্তনশীল ও নশ্বর, কিন্তু দেহমধ্যস্থ সূক্ষ্ম আত্মা চিরনিত্য, অবিনাশী, জন্ম-মৃত্যুহীন। দেহ জীর্ণ হলে আত্মা জীর্ণ পোশাকের মতো সেটি পরিত্যাগ করে আর একটি নতুন দেহ ধারণ করে। তাই দেহের মৃত্যুতে শোক করা নিরর্থক।

কর্মে বিরত না হয়ে, ফল ভগবানে সমর্পণ করে স্বধর্ম পালনে নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। সকাম কর্ম জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। এমন কি বেদোক্ত কর্মকাণ্ডও কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে। তাই ধনৈশ্বর্য, স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ প্রভৃতি ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে, ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবামূলক কর্ম করা কর্তব্য। এই রকম ভগবদ্ভক্তিমূলক নিষ্কাম কর্মযোগের ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়; ফলে সমস্ত অজ্ঞানতা, পাপ ও মোহ বিদূরিত হয়। যিনি এইভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করে পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত, সংযত হয়েছেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনি দেহান্তে চিন্ময় জগতে উন্নীত হন। কিন্তু জড় ভোগ-উন্মুখ, অশান্তচিত্ত ব্যক্তি জড়াসক্তি, কাম, ক্রোধে অভিভূত হয়ে ক্রমশ জড় জগতের অন্ধকূপে নিপতিত হয়।

● অর্জুনকে ভর্ৎসনা

শ্লোক ১-৩

আসন্ন স্বজন-বধের চিন্তায় অর্জুন অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছিলেন। তাঁকে শোকসন্তপ্ত চিত্তে অশ্রুপাত করতে দেখে, করুণা-পরবশ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টস্বরে তাঁকে বললেন, "হে প্রিয় অর্জুন! কেন তুমি এই ঘোর সংকটকালে অজ্ঞানতা ও শোকে অভিভূত হচ্ছ? হে পার্থ! এটি তোমার পক্ষে যশোহানিকর। তোমার এই রকম ক্লীব আচরণ শোভা পায় না। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।"

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণকে এখানে 'ভগবান' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র গীতাতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বলা হয়েছে ঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, কারণ তার ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন অনাদির আদি পুরুষ গোবিন্দ এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ।"

'ভগবান' কথাটির বিশ্লেষণ করে পরাশর মুনি বলেছেন যে, **সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান** এবং **সমগ্র বৈরাগ্য** — এই ছয়টি ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান।

মানুষের মধ্যে অনেককে খুব ধনী, যশস্বী ও জ্ঞানী হতে দেখা যায়, কিন্তু জগতে এমন কেউ নেই যার মধ্যে উক্ত ছয়টি গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এমনকি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের মধ্যেও তা আংশিকভাবে রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন। তাই তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। তিনিই সব কিছুর উৎস, সব কিছুর পরম কারণ, সকল ঐশ্বর্যের প্রভু। সর্বব্যাপ্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবহৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণেরই

শব্দার্থ ঃ সাংখ্য—সাংখ্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান। এই অধ্যায়ে দেহ ও আত্মার পার্থক্য বিষয়ক জ্ঞান উপদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভগবান কথিত এই সাংখ্য আর নিরীশ্বরবাদী কপিলের সাংখ্য দর্শন এক নয়। কপিলের সাংখ্য দর্শন মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা মাত্র। **পরন্তপ**—শত্রু দমনকারী, অর্জুন; **বীর্য**—শৌর্য, বীরত্ব, কর্মশক্তি; **শ্রী**—সৌন্দর্য, শোভা।

প্রকাশ। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহ ও শোক দেখে তাঁর আচরণকে অনার্য-জনোচিত বলে ভর্ৎসনা করছেন। আর্য হচ্ছেন তিনি, যিনি জীবনের মূল্য বোঝেন, অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তিতে আচরণ করেন। যে নিজেকে অস্থায়ী দেহ বলে মনে করে এবং দেহবোধের ভিত্তিতে অজ্ঞানতা, শোকে মুহ্যমান হয়, যে জীবনের উদ্দেশ্য জানে না, সে অনার্য। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। মিথ্যা মোহে অভিভূত হয়ে অর্জুন তার কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন, যা তাঁর অপযশ ঘোষণা করবে। ভগবান তাই তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনকে সমস্ত দুর্বলতা, ক্লীবতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করছেন।

● শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের পূর্ণ আত্মসমর্পণ

শ্লোক ৪-৯

তখন অর্জুন বললেন, "হে মধুসূদন! আমি ভীষ্ম-দ্রোণের মতো আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের জীবনহানি করে তাদের রুধিরলিপ্ত রাজ্যসুখ ভোগের চেয়ে বরং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। রণাঙ্গনে উপস্থিত এই সব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নিহত হলে, আমাদের বেঁচে থেকে আর কি লাভ হবে?"

তিনি আরও বললেন, "হে কৃষ্ণ! আমি বুঝতে পারছি না জয়ী হওয়া ভাল, না পরাজিত হওয়া ভাল। আমি সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি; জানি না আমার এখন কি করা উচিত। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে শিক্ষাদান কর।"

স্বজন হত্যার চিন্তায় উদ্বিগ্ন ও শোকসন্তপ্ত অর্জুন অবশেষে বললেন, "হে কৃষ্ণ! শোকানলে আমার দেহেন্দ্রিয় জ্বলছে। সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য পেলেও এই শোক প্রশমিত হবে না। হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না।" এই বলে তিনি মৌন হলেন।

বিশ্লেষণ

আমাদের জড়-জাগতিক জীবনে রয়েছে অপরিহার্য দুঃখকষ্ট ও সমস্যা। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রতিটি জীবকে এর সম্মুখীন হতে হয়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে, গুরু-পরম্পরা ধারায় ভগবৎ-

শব্দার্থ ঃ রুধিরলিপ্ত — রক্তমাখা; **মৌন** — নির্বাক।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এমন সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া। জড় জগতের মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন না থেকে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া এবং শাশ্বত দিব্য জ্ঞান লাভ করে অমূল্য মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার করা।

মহাবলী অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করছেন। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের এই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবদ্‌গীতার আদি গুরু, আর অর্জুন প্রথম শিষ্য। আমাদের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ হতে পরম্পরাক্রমে আগত বর্তমান কোন উপযুক্ত সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া, এবং চিরতরে সংসার-ক্লেশ দূর করার জন্য তাঁর নিকট শুদ্ধ বৈদিক জ্ঞান লাভ করা।

● জীব নিত্য, জড় দেহ নশ্বর

শ্লোক ১০-১২

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হেসে বিষাদমগ্ন অর্জুনকে বললেন, "হে অর্জুন! তুমি একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা অনুচিত, সেই বিষয়ে শোক করছ। জীবিত বা মৃত কারও জন্য প্রকৃত পণ্ডিত কখনও শোক করেন না।"

সকল জীবসত্তার নিত্যতা অর্থাৎ শাশ্বত অস্তিত্বের সত্য ব্যক্ত করে তিনি আরও বললেন, "অতীতে এমন কোন সময় ছিল না, যখন আমি, তুমি ও এই রাজাদের অস্তিত্ব ছিল না, ভবিষ্যতেও এমন কোন সময় আসবে না, যখন আমরা থাকব না।"

বিশ্লেষণ

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব বরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরোক্ষভাবে মহামূর্খ বলে শাসন করছেন। জড় দেহটি নশ্বর, বিনাশশীল, কিন্তু আত্মার কখনও বিনাশ বা মৃত্যু হয় না। আত্মাই হচ্ছে জীবের প্রকৃত সত্তা। অতএব প্রকৃতপক্ষে কোন জীবের মৃত্যু নেই। তা হলে যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি কেন শোক করবেন?

প্রতিটি জীবসত্তাই নিত্য; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — কোন কালেই জীবসত্তার বিনাশ বা বিলুপ্তি নেই। মায়াবাদীরা বলেন, "মুক্তির অর্থ হচ্ছে আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হওয়া, ব্রহ্মে লীন হওয়া।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে

শব্দার্থ ঃ নশ্বর — বিনাশশীল, Perishable.

স্পষ্টভাবে বলছেন যে, সকল জীব তাদের ব্যক্তিগত সত্তা নিয়ে নিত্যকাল বিরাজমান। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ — কোন কালে জীব কোন অবস্থাতেই তার স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে না, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায় না। প্রতিটি জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক।

অতএব যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি জীবের অস্থায়ী জড় দেহের বিনাশে কখনও শোকাচ্ছন্ন হন না, কারণ আত্মা নিত্য, সনাতন।

● **আত্মার দেহান্তর**

শ্লোক ১৩

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "দেহ ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় — কৌমার থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে। মৃত্যুও ঠিক তেমনই দেহের একটি রূপান্তর। মৃত্যুর মাধ্যমে দেহী বা আত্মা আবার একটি নতুন দেহ লাভ করে। ধীর ব্যক্তি এই কথা জানেন, তাই তাঁরা শোকে মুহ্যমান হন না।"

বিশ্লেষণ

জড় দেহ সতত পরিবর্তনশীল। আজ যে শিশু, অচিরেই সে যুবক হয়, তারপর বৃদ্ধ হয়। কিন্তু দেহ এইভাবে পুরো বদলে গেলেও ব্যক্তিটি বদলায় না। ব্যক্তিটি কেন এক থাকে? তার কারণ হচ্ছে প্রকৃত ব্যক্তিটি দেহ নয়, দেহস্থ আত্মা। আত্মাই হচ্ছে জীবের আসল স্বরূপ, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এই জড় জগতে সে আর একটি জড় দেহ লাভ করে, অথবা জড় বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবৎ ধামে একটি জরা-মৃত্যুহীন চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য কারও জড় দেহের পরিবর্তনে বা বিনাশে জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না।

শ্লোক ১৪-১৫

হে কৌন্তেয়! যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হয়, তখন সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়। কিন্তু এই সুখ বা দুঃখের অনুভূতি অনিত্য, ঠিক শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর আসা যাওয়ার মতো। তাই হে ভারত! সেগুলি সহ্য কর। যিনি এই সব ইন্দ্রিয়জ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে শান্ত, অবিচলিত থাকেন, তিনিই অমৃতত্ব লাভের অধিকারী।

শব্দার্থ ঃ কৌমার — এক হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়স। (ভঃ রঃ সিন্ধু)

বিশ্লেষণ

শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেহটি বিনষ্ট হবেই। তাই দেহকে কেবল অনিত্য সুখ-দুঃখ অনুভবে ব্যস্ত না রেখে, মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করা উচিত। এটিই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। যেমন ভোরে স্নান করা পারমার্থিক উন্নতির সহায়ক, তাই সাধুগণ প্রচণ্ড শীতেও ভোরে স্নান করার কষ্ট সহ্য করেন।

বর্ণাশ্রম প্রথায় চতুর্থ আশ্রম— সন্ন্যাস আশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু গৃহ ও পরিবারের মিথ্যা আসক্তি ছিন্ন করে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে ভগবৎ শরণাগত হন, তাঁরা অচিরেই ভগবৎ-দর্শনে সক্ষম হন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি জীবকে ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন দান করানোর মহত্তম কর্তব্য সাধনের জন্য যুবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতাকে রেখে, মাত্র ২৪ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

● দেহ ও আত্মার পার্থক্য

শ্লোক ১৬-১৯

নিত্য, অবিনাশী সত্তা আত্মা এবং বিনাশশীল জড় দেহের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই, আর নিত্য বস্তু আত্মার কোন বিনাশ নেই — এই হচ্ছে তত্ত্বদ্রষ্টাগণের সিদ্ধান্ত। জেনে রেখো, জড় শরীরে পরিব্যাপ্ত চিন্ময় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে পারে না। কারণ শরীর অনিত্য, কিন্তু আত্মা অব্যয়, অবিনশ্বর। আত্মা এতই সূক্ষ্ম যে, তা প্রায় পরিমাপযোগ্য নয়। আত্মা কখনও কাউকে হত্যা করে না বা কারও দ্বারা কখনও নিহতও হয় না। যাঁরা জীবসত্তাকে হত্যাকারী বা নিহত বলে ভাবেন, তাঁদের আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। অতএব হে ভারত! তুমি স্বধর্ম অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

বিশ্লেষণ

চেতনা হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। জড় পদার্থ থেকে কখনও চেতন সত্তার উদ্ভব হয় না, কারণ দুটি বস্তু পরস্পর ভিন্ন ধর্মী। আত্মাই চেতনার উৎস। জড় বস্তু নির্মিত শরীর সদা পরিবর্তনশীল এবং অচিরেই সেটির বিনাশ হয়, যাকে বলা হয় মৃত্যু। কিন্তু নিত্য আত্মা অবিনাশী, অক্ষয়। তাই দেহকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু আত্মাকে ধ্বংস করা যায় না। শরীর চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে;

শব্দার্থ ঃ অবিনাশী—যার বিনাশ নেই (Imperishable)।

যখন সেটি এই কাজের অনুপযোগী হয়, তখন আত্মা সেই দেহ ত্যাগ করে। তখন আত্মা আর একটি ভিন্ন শরীর লাভ করে, যাকে বলা হয় পুনর্জন্ম। আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং চিন্ময়, তাই তাকে দেখা যায় না, কিন্তু চেতনা প্রকাশের লক্ষণ দেখে দেহে আত্মার উপস্থিতিকে অনুভব করা যায়।

আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, একটি কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের একভাগ। কিন্তু এই আত্মার প্রভাবে সমগ্র দেহে চেতনা পরিব্যাপ্ত থাকে। আত্মাই জড় দেহকে প্রতিপালন করে। সেই জন্য বেদান্তসূত্রে আত্মাকে 'আলোক' বলা হয়েছে। সূর্যালোক যেমন ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিপালন করে, তেমনই আত্মার উপস্থিতির প্রভাবে জড় দেহের ক্রিয়াকলাপ চলে। আত্মা শরীরটি ত্যাগ করা মাত্রই শরীরটি পচতে শুরু করে। তাই আত্মাই হচ্ছে প্রকৃত জীবসত্তা, যাকে কখনও হত্যা করা যায় না। তাই দেহের মৃত্যুতে জ্ঞানী ব্যক্তি শোক করেন না।

● আত্মার দেহ-রূপ পোশাক পরিবর্তন

শ্লোক ২০-২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। দেহের মতো আত্মার বৃদ্ধিও হয় না। দেহের বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। হে পার্থ! এইভাবে যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি কিভাবে কাউকে হত্যা করবেন?

মানুষ যেমন পুরানো জীর্ণ কাপড় পরিত্যাগ করে আর একটি নতুন কাপড় পরিধান করে, ঠিক তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে আত্মা নতুন আর একটি দেহ ধারণ করে।

বিশ্লেষণ

জড় দেহ আত্মার পোশাক মাত্র। আমরা জামা গায়ে দিই, কিন্তু আমরা জামা নই। তেমনই জড় জগতে এসে আমরা জড় উপাদানে তৈরি দেহ ধারণ করি, কিন্তু আমরা দেহ নই। আমরা হচ্ছি শাশ্বত চিন্ময় আত্মা, যা স্বয়ং ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ। জামাটি যখন পুরানো হয়, ছিঁড়ে

দেহান্তরের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত — একটি শুঁয়োপোকা পূর্ণাঙ্গ হলে মুখের লালা দিয়ে একটি গুটি বানায়। তারপর জীবনের বিভিন্ন দশায় ওই গুটির মধ্যে তার দেহটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। এক সময় গুটিটি ভেঙে বেরিয়ে আসে একটি প্রজাপতি। পড়ে থাকে শুঁয়োপোকার বর্জিত খোলস। তাই যদিও এই জীবটির দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে, তবু তার জীবন বা আত্মা কিন্তু একই আছে — এখন সুন্দর একটি প্রজাপতির দেহে।

যায়, তখন আমরা যেমন সেটি বাদ দিয়ে নতুন আর একটি পোশাক পরি, তেমনই শরীর জীর্ণ হলে, আত্মা সেটি ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।

জড়দেহের ছয়টি পরিবর্তন

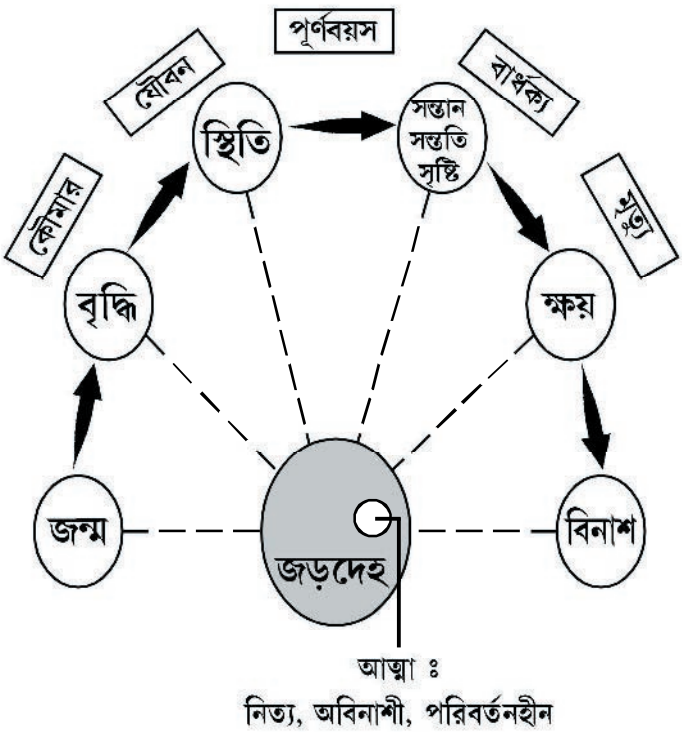

প্রত্যেকটি জীবের যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা হচ্ছে তার দেহের, আত্মার নয়। জড় দেহের ছয়টি পরিবর্তন রয়েছে ঃ (১) মাতৃগর্ভে দেহের জন্ম (২) বৃদ্ধি (৩) কিছুকাল স্থিতি (৪) উৎপাদন (সন্তানসন্ততি সৃষ্টি) (৫) ক্ষয় বা জরাগ্রস্ততা এবং (৬) বিনাশ বা মৃত্যু।

শব্দার্থ ঃ সর্বগত—সর্বব্যাপী ; **সনাতন**—শাশ্বত (eternal); **অচিন্ত্য**—জড় চিন্তা-কল্পনার অতীত; **অচল**—অপরিবর্তনীয়।

আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং পূর্ণ চেতনাময়। সেই জন্য যখনই কোন জড় বস্তুর মধ্যে চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে আত্মা উপস্থিত রয়েছে। এইভাবে কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, পশু, মানুষ — সবারই মধ্যে রয়েছে চিৎকণ আত্মা, যদিও তাদের চেতনার বিকাশের তারতম্য রয়েছে। চেতনার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে জীবসত্তা বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে থাকে।

জীবাত্মা জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে নানা দুঃখ-দুর্দশা অবিরাম ভোগ করে। কিন্তু যখন সে পরম চেতন পরমাত্মার শরণাগত হয়, তখন তার সমস্ত কষ্টের অবসান হয়।

● আত্মার নিত্যতা

শ্লোক ২৩-২৫

আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, আগুনে দগ্ধ করা যায় না, জলে ভেজানো যায় না অথবা বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না। তিনি চির-অস্তিত্বশীল, সর্বগত, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকার-রহিত। এইভাবে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জেনে, অর্জুন তুমি শোক পরিত্যাগ কর।

বিশ্লেষণ

জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে তা অবিনশ্বর, জড়া শক্তিতে এই চিন্ময় কণিকার বিনাশ ঘটানো যায় না।

পরমাত্মার কৃপায় অণুসদৃশ জীবাত্মা তার চেতনা অনুসারে বিভিন্ন দেহ লাভ করে। কিন্তু পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুর মতো জীবাত্মার সঙ্গে থাকেন। কঠোপনিষদে একই বৃক্ষে বসে থাকা দুটি পাখির সঙ্গে আত্মা-পরমাত্মার তুলনা করা হয়েছে।

একটি পাখি (জীবাত্মা) কটু বা মিষ্ট ফল খাচ্ছে, অর্থাৎ তার নিজ কৃত কর্মের সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করছেন, অন্য পাখিটি (পরমাত্মা) তাঁর বন্ধুকে দেখছেন। দুটি পাখিই গুণগতভাবে এক, তবু একজন জড়-জাগতিক ফলভোগের আকর্ষণে আবদ্ধ, অন্যজন তার সাক্ষী বা দ্রষ্টা।

জীব জলে, স্থলে, এমন কি সূর্যালোকেও বাস করতে পারে। সেই জন্য জীবকে 'সর্বগত' (আত্মার গতি সর্বত্র) বলা হয়েছে। মায়ামুক্ত হবার পর, জীবাত্মা

শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্ম জ্যোতিতে বিরাজ করতে পারে। জ্ঞানীরা এই রকম মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু সর্বোচ্চ মুক্তি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ভগবানের আনন্দপূর্ণ ব্যক্তিগত সাহচর্য লাভ, কেবল শ্রীকৃষ্ণের অনন্য শরণাগত জীবই এই রকম গতি লাভ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেশ কয়েকটি শ্লোকে দেহ ও আত্মার পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রধান পার্থক্যগুলি নীচে দেখানো হল।

দেহ ও আত্মার পার্থক্য

জড়দেহ	আত্মা
১। অচেতন।	১। চেতনাময়, দেহে পরিব্যাপ্ত চেতনার উৎস।
২। জড়, জড় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।	২। চিন্ময়, অজড়, চিৎকণা।
৩। সদা পরিবর্তনশীল, বৃদ্ধি-ক্ষয় প্রভৃতি ছ'টি পরিবর্তনের অধীন।	৩। চির-অপরিবর্তনীয়, 'অবিকারী' অব্যয়, অক্ষয়।
৪। নশ্বর, বিনাশশীল, অনিত্য।	৪। অবিনশ্বর, নিত্য, সনাতন।
৫। ভগবানের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি।	৫। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পরা প্রকৃতি-সম্ভূত।
৬। স্থূল, পরিমাপযোগ্য।	৬। সূক্ষ্ম, অপরিমেয়।
৭। ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য।	৭। জড়-ইন্দ্রিয়ের অগোচর (কারণ আত্মা জড় পদার্থ নয়)।
৮। অস্ত্রাদির দ্বারা কাটা যায়, জল ও আগুনে বিকৃত করা যায়।	৮। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য।
৯। অজ্ঞান, বস্তুপিণ্ড মাত্র।	৯। জ্ঞানস্বরূপ।
১০। দুঃখ-ক্লেশের আধার স্বরূপ।	১০। আনন্দময়।

● দেহের জন্য শোক করা নিরর্থক

শ্লোক ২৬-২৮

হে মহাবাহো! তুমি যদি এমনও ভাব যে, আত্মার বার বার জন্ম-মৃত্যু হয়, তা হলেও শোক করা নিরর্থক। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই, আর যার মৃত্যু হয়েছে, তার অবশ্যই আবার জন্ম হবে। তা হলে নিজের কর্তব্য করতে গিয়ে কেন তোমার এই শোক? হে ভারত! সমস্ত জীবের জড় শরীরগুলি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ছিল না, মধ্যে কিছুকাল প্রকাশিত থাকার পর আবার সেগুলি বিলুপ্ত হবে। তাহলে শোক করা কিসের জন্য?

বিশ্লেষণ

জড়-বিজ্ঞানীরা তাদের একটি অনুমান প্রচার করে থাকে যে, জড় পদার্থের মধ্যে বহুকাল ধরে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলার ফলে আপনা থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালেও লোকায়তিক (চার্বাক), বৌদ্ধ ও বৈভাষিক দার্শনিকেরা এই রকম মত পোষণ করত। এদেরকে বলা হয় নাস্তিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে, এই রকম মতবাদে বিশ্বাসী হলেও শোক করার কারণ নেই। কারণ সৃষ্টির পূর্বে জড় পদার্থগুলি নিরাকার থাকে; মাঝে জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, আবার তা বিলীন হয়। ঠিক যেমন ইট, বালি, সিমেন্ট মাটি থেকে উদ্ভূত; এদের সাহায্যে একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়, তা কিছুকাল থাকে, তারপর ধ্বংস হয়ে পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। তেমনই জড় শরীরের আবির্ভাব, সাময়িক স্থিতি ও অন্তর্ধান ঘটে। তাই শোক করা নিরর্থক।

প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক জ্ঞান আমাদের আত্মার নিত্যতা ও দেহের নশ্বরতা উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত করে। এই রকম উপলব্ধি হলে আর শোক—মোহ থাকে না। অবশ্য তাই বলে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে অনর্থক যুদ্ধ, হিংসা ও হত্যাকে অনুমোদন করা হয়নি। সমাজের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও কখনও যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এবং একজন ক্ষত্রিয়ের উচিত সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হওয়া। এই ধর্মযুদ্ধ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

শ্লোক ২৯-৩০

ভগবান বললেন, অনেকের কাছেই এই আত্মার কথা খুব আশ্চর্যজনক। অনেকে আত্মার কথা জানলেও, যথার্থভাবে তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। হে

শব্দার্থ ঃ চিৎ-জগৎ — অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধাম।

ভারত! প্রতিটি জীবদেহে অবস্থিত দেহী বা আত্মা হচ্ছে অবধ্য, নিত্য। তাই কোন জীবের দেহত্যাগে শোক কোরো না।

বিশ্লেষণ

বিশালাকায় বটবৃক্ষে, আবার ক্ষুদ্র একটি জীবাণুর মধ্যে এই চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ, পরমাণুতুল্য আত্মা অবস্থান করে, যা অনেকের কাছে আশ্চর্যের। মন-বুদ্ধি পবিত্র না হলে আত্মাকে অনুভব করা যায় না। অনেকে আবার ভেবে থাকে যে, জীবাত্মা মায়ামুক্ত হলে পরমাত্মায় পরিণত হয়—এদের বলা হয় মায়াবাদী।

জড় বিজ্ঞানীরা আবার এতই মোহাচ্ছন্ন যে, তারা জীবের মধ্যে কোন চিৎ-শক্তির অস্তিত্বই উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলমাত্র অত্যন্ত সৌভাগ্যবানেরাই জানেন যে, প্রতিটি জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীব-হৃদয়ে পরমাত্মারূপে রয়েছেন, আর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধনমুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হওয়া।

● যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম

শ্লোক ৩১-৩৮

হে পার্থ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। এই স্বধর্ম পালন করলে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তা হলে সবাই তোমার নিন্দা করবে, বলবে তুমি ভয়ে রণক্ষেত্র হতে পালিয়েছ। এই রকম অমর্যাদা, মৃত্যুর চেয়েও অসহ্য। যুদ্ধে জয়ী হলে রাজ্যভোগ, নিহত হলে স্বর্গলাভ। তাই যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠে দাঁড়াও। লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, জয়-পরাজয়কে সমজ্ঞান করে যুদ্ধ কর, তা হলে তোমার কোন পাপ হবে না।

বিশ্লেষণ

চারটি বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় হচ্ছে সমাজ-দেহের বাহুর মতো। ক্ষত্রিয়ের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করা। ক্ষত্রিয় প্রয়োজনে দুরাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিজের জীবনদান করতেও সদা প্রস্তুত থাকে। এই জন্য ছোটবেলা থেকে তাকে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয়। ক্ষত্রিয়েরা যদি স্বধর্ম পালন না করে, তা হলে সমাজ বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়। সেটি ভগবান অনুমোদন করেননি। তিনি অর্জুনকে তাঁর ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

● ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ

শ্লোক ৩৯-৪১

আত্মা ও দেহের পার্থক্য দর্শন করিয়ে অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের উপদেশ দানের পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ কর্মপন্থা অর্জুনকে ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বললেন, "হে পার্থ! এখন ভক্তিযোগযুক্ত নিষ্কাম কর্মের কথা শোন। এর মাধ্যমে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়। আর এতে কোন ব্যর্থতা নেই। এই যোগ স্বল্পমাত্র আচরণ করলেও তা আচরণকারীকে মহাভয় থেকে রক্ষা করে। হে অর্জুন! যারা এই পথ গ্রহণ করে, তাদের মন-বুদ্ধি একনিষ্ঠ, ভগবৎ-মুখী হয়। পক্ষান্তরে সকাম কর্মীদের চিত্ত অস্থির, আর বুদ্ধি বহুধা বিভক্ত হয়।"

বিশ্লেষণ

জীব সর্বদাই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনায় কর্ম করছে। এই সব কর্মের ফল ভোগের জন্য তাকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। একে বলা হয় কর্মবন্ধন। এইভাবে অনন্তকাল ধরে আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে অবিরাম সংসার-ক্লেশ ভোগ করি। এর থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি?

একমাত্র উপায় হল ভগবান মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া; শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করা। এইভাবে যখন আমাদের সমস্ত কর্মকে ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করি, তখন অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভূত হয়। তখন নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনাবেগ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়, হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। অন্তিমে জড় বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়।

ভগবৎ-সেবা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত; তা জড়-জাগতিক সমস্ত ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত। ভগবান সর্বকারণের কারণ। তাই, একটি গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা তৃপ্ত হয়, তেমনই ভগবানের সেবা করলে পরিবার দেশ-জাতি-সমাজ সবেরই কল্যাণ সাধিত হয়। এই ভগবৎ-সেবাময় কর্মযোগ এতই শক্তিশালী যে, সামান্য অনুশীলন করলেও তা মহাবিপদ থেকে তাকে রক্ষা করে; তা কখনও ব্যর্থ হয় না। এই জন্মে ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ না হলে, পরের জন্মে সে আবার তা শুরু করার সুযোগ পায়।

● বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য

শ্লোক ৪২-৪৬

বেদে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উচ্চকুলে জন্ম, স্বর্গপ্রাপ্তি, নানা ক্ষমতা-ঐশ্বর্য লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সবই ইন্দ্রিয়সুখ মাত্র। কেবল অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন বিবেকহীন মানুষই বেদের এই সব পুষ্পিত বাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে সকাম কর্মে আসক্ত হয়। তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। তারা মনে করে যে, এর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। কেবল ঐশ্বর্য আর ভোগের প্রতি আসক্ত থাকায় তাদের বুদ্ধি সব সময় অস্থির, শত শত আশায় উত্তেজিত। তাদের চিত্ত কখনও ভগবানে সমাধিস্থ হয় না। হে অর্জুন! বেদের এই কর্মকাণ্ড জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ ও তম) প্রভাবিত। তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে অপ্রাকৃত চেতনায় স্থিত হও।

বিশ্লেষণ

মানুষকে স্বর্গলাভ করানো বেদের আসল উদ্দেশ্য নয়। বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে অধ্যাত্মমার্গে নিয়ে আসা এবং ক্রমশঃ ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধিতে তাদের সাহায্য করা। শ্রীকৃষ্ণই বেদের অন্তিম জ্ঞাতব্য বিষয় — *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে বেদান্ত-দর্শনের সারমর্ম। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি লাভের সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সশ্রদ্ধ অন্তরে কীর্তন করা। যিনি এইভাবে অসীম আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই প্রকৃত বেদান্ত-তত্ত্ববেত্তা।

● কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণের মাধ্যমে জড় বন্ধন থেকে মুক্তি

শ্লোক ৪৭-৫১

হে অর্জুন! স্বধর্ম-বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কর্ম-ফলে নয়। তাই ফলভোগের কামনা ত্যাগ করে, বুদ্ধিযোগের সাহায্যে ভগবৎ-সেবাময় কর্ম কর। জেনে রাখ, যারা কামনাযুক্ত কর্ম করে ফলভোগ করতে চায়, তারা কৃপণ। আর যিনি ভগবদ্ভক্তিময় কর্ম করেন, তিনি এই জীবনেই পাপ-পুণ্য উভয় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইভাবে বুদ্ধিমান মনীষিগণ ভগবানের শরণাগত হয়ে, তাদের কর্মার্জিত ফল ভগবানকে সমর্পণের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শব্দার্থ ঃ বেদ্য — জানার বিষয়, জ্ঞাতব্য।

বিশ্লেষণ

কর্মকে যখন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা হয়, তখন তা হয় কর্মযোগ। যিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস রূপে উপলব্ধি করেন, তিনি সমস্ত সকাম কর্ম, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হন। এইভাবে ভগবৎ-সেবাময় কর্মের ফলে জড় বন্ধন হতে তিনি মুক্ত হন।

পক্ষান্তরে, যারা তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কামনাযুক্ত কর্ম করে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাদের কৃপণ বলেছেন। কারণ তারা সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্য তাদের কর্মশক্তিকে যথার্থ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেনি। তারা কর্মবন্ধনে বিজড়িত হয়, আর চিরকাল অত্যন্ত দুঃখময় সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে — জন্ম-জন্মান্তর ধরে। মনীষিগণ কিন্তু কেবল ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য কর্ম করেন, এবং তার ফলে সম্পূর্ণরূপে জড়ক্লেশ থেকে মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে — "পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সব কিছুর আশ্রয় এবং যিনি মুক্তিদাতা মুকুন্দ নামে খ্যাত, তাঁর পদপল্লবরূপ তরণীর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন। তাঁর কাছে এই ভবসমুদ্র গোষ্পদতুল্য। দুঃখ-ক্লেশের অতীত পরম ধাম বৈকুণ্ঠ হচ্ছে তাঁর গন্তব্যস্থল। যে জগতে পদে-পদেই বিপদ, সেখানে তিনি আবদ্ধ থাকতে চান না।" *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৫৮)

● **দিব্যজ্ঞান লাভ, পূর্ণ মোহমুক্তি**

শ্লোক ৫২-৫৩

হে অর্জুন! এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে তোমার হৃদয় শুদ্ধ হবে। এইভাবে তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্য অতিক্রম করবে এবং তখন তুমি সম্পূর্ণ ভক্তিযোগে যুক্ত হবে। তার ফলে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করবে; বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা তোমার বুদ্ধি আর বিভ্রান্ত হবে না।

বিশ্লেষণ

ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্ম সাধন করলে, ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি ও দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হয়। তখন বুদ্ধি মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সমস্ত মতবাদ, জল্পনা-কল্পনা, বৈদিক শাস্ত্রাদির বিচিত্র বাক্য তাঁকে আর বিমোহিত করতে পারে

শব্দার্থ ঃ দিব্যজ্ঞান — নিত্য, চিন্ময়, অপ্রাকৃত জ্ঞান।

না। তখন শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডীয় আচার-নিয়ম, যাগযজ্ঞের কোন প্রয়োজন তাঁর থাকে না। তিনি শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবৎ-সেবাময় কর্মে নিয়োজিত হন।

● স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ

শ্লোক ৫৪-৫৮

তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কেশব! এই রকম দিব্য জ্ঞানে অধিষ্ঠিত স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের লক্ষণ কি? তাঁর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা কেমন?"

উত্তরে ভগবান বললেন — "হে পার্থ! যিনি সমস্ত মনোগত জল্পনা-কল্পনা, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ আত্মচেতনায় স্থিত, সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়েছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এই অবস্থায় মহা দুঃখও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। সুখেও তিনি নিস্পৃহ থাকেন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে তিনি মুক্ত। তিনি বিষয় বাসনাহীন, সর্বদা অনুদ্বিগ্ন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ সংযত। কচ্ছপ যেমন দেহের অংশগুলি খোলসে গুটিয়ে নেয়, তেমনই বাহ্য জড় বিষয় হতে তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করতে পারেন।"

বিশ্লেষণ

যে ভোগ বাসনায় অধীর, সে সর্বদা অশান্ত, উত্তেজিত। কিন্তু যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তিনি সব সময় এক গভীর চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। ফলে তিনি বাহ্যিক সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না, এবং বিষয়ভোগের নিকৃষ্ট আকর্ষণে আর প্রলুব্ধ হন না। তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিষয়ভোগীর ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ ইন্দ্রিয়ভোগ চেতনাকে মোহাচ্ছন্ন ও কলুষিত করে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখেন, ফলে সেগুলি সর্বদা সংযত ও তৃপ্ত থাকে।

শ্লোক ৫৯-৬১

হে অর্জুন! কোন দেহধারী জীব জোর করে তার ইন্দ্রিয়কে বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে, কিন্তু তার মন থেকে ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্তি দূর হয় না। কিন্তু যিনি উচ্চতর আনন্দ আস্বাদন করেন, তাঁর অন্তর হতে আপনা থেকেই সমস্ত বিষয়ভোগের বাসনা দূর হয়। হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গুলি এতই

শব্দার্থ ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ — জড় ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যার মন নিষ্কলুষ হয়েছে, যার প্রজ্ঞা ভগবানে স্থিরভাবে নিবদ্ধ হয়েছে।

বলবান যে, অনেক ধীর, সংযত মানুষের চিত্তকেও বিক্ষিপ্ত করে। তাই যিনি আমার প্রতি উত্তমা ভক্তি লাভ করে ইন্দ্রিয়বেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করছেন, ভাল কিছুর স্বাদ না পেয়ে মন খারাপ কিছু ত্যাগ করতে পারে না। জোর করে ইন্দ্রিয় দমন করা সম্ভব নয়। যোগীরা বাহ্যিকভাবে তাতে সমর্থ হলেও তাদের অন্তর হতে বিষয় ভোগতৃষ্ণা দূর হয় না।

মন যখন কৃষ্ণপদারবিন্দে আসক্ত হয়, তখন অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভূত হয়। তা এতই সুন্দর ও মধুর যে, তখন তার পুতিগন্ধময় বিষয়ভোগে অনুরাগ থাকে না। কৃষ্ণভক্তি সম্পাদনের ফলে আপনা থেকেই দিব্যজ্ঞান ও দিব্য আনন্দ লাভ হয় এবং মন-বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্মল ও শান্ত হয়।

বর্তমানে মানুষ ভোগবাদের প্রবলতায় দিশেহারা। কোন শুষ্ক মতবাদের সাহায্যে এই লাগামহীন ভোগবাদ ও অবক্ষয়কে রোধ করা যাবে না। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী মানুষদের জন্য ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দ আস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা। তা হলে আপনা থেকেই এই রোগবিকার দূর হয়ে যাবে, মানব-সভ্যতা শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হবে।

● জড় জগতে পতনের ক্রম

শ্লোক ৬২-৬৩

ইন্দ্রিয়সুখ চিন্তার বিষময় পরিণতি ব্যাখ্যা করে ভগবান বললেন—"হে অর্জুন! ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের কথা মনে চিন্তা করতে করতে তাতে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে সেই সব সুখদায়ক বস্তু লাভের জন্য কামনার উদয় হয়। কামনা বাধা পেলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের ফলে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হয়। এইভাবে মোহ হতে ক্রমশ স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং এইভাবে বুদ্ধিনাশের ফলে মানুষ ক্রমশ জড় জগতের সুগভীর অন্ধকূপে নিপতিত হয়।"

বিশ্লেষণ

যার হৃদয়ে এখনও ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয়নি, তার মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় চিন্তা করা মাত্রই সেগুলির প্রতি আসক্ত হয়। তা লাভের জন্য বাসনা উদিত হয়। বস্তুত জড় জগতে শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া সকলেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত

হয়। এমন কি বহু মুনি - ঋষি, দেব - দেবীও তাঁদের সংযমের বাঁধ ভেঙে বিষয়ভোগে প্রলুব্ধ হয়ে পতিত হন। কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ভোগবাসনাকে অতিক্রম করতে পারেন। ভগবান এরপর তা বর্ণনা করছেন।

● ভক্তিযোগীর গতি

শ্লোক ৬৪-৬৫

যিনি তাঁর চিত্তকে সংযত করে জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা দ্বেষ থেকে মুক্ত হন এবং ইন্দ্রিয়গণকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করেন, তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন। এইভাবে ভগবৎ-কৃপায় তাঁর সর্বদুঃখ ধ্বংস হয়, তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়, এবং তাঁর বুদ্ধি পরমানন্দময় চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়।

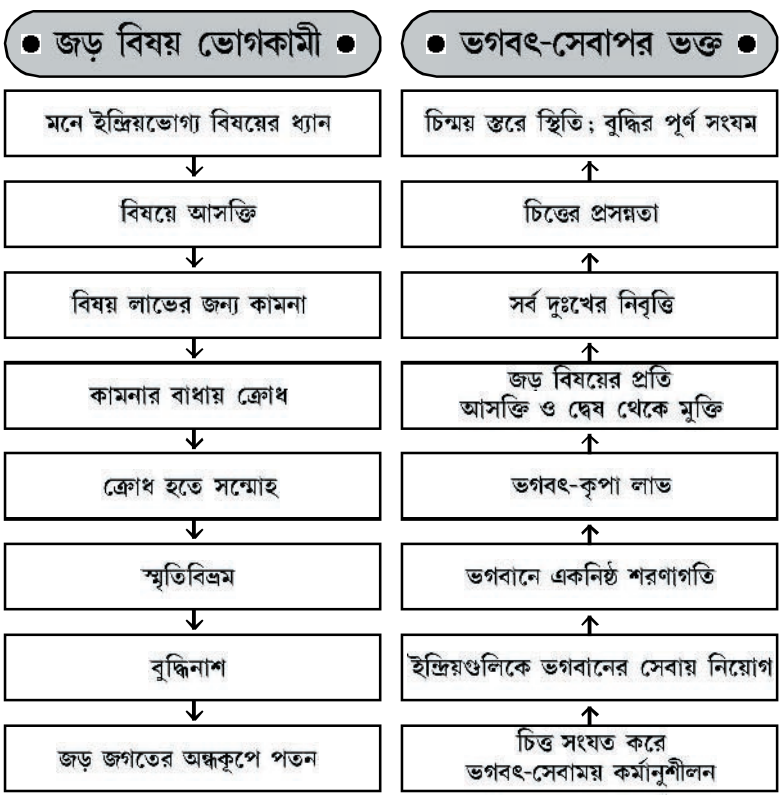

বিশ্লেষণ

শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। তাঁর একমাত্র অভিলাষ হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছানুসারে কাজ করা। তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে কেবল দমনই করেন না, সেগুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। এই রকম অনন্যচিত্ত ভক্ত ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সমস্ত জড় কলুষ হতে মুক্ত হন; তাঁর চেতনা তখন শুদ্ধ হয়। তিনি সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-প্রসাদে সর্বতোভাবে প্রসন্ন হন।

● ইন্দ্রিয়ভোগী অশান্ত, সংযমী শান্ত

শ্লোক ৬৬-৬৯

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়নি তার চিত্ত সংযত নয়, বুদ্ধি স্থির নয়। এই রকম পারমার্থিক বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি সব সময় বিষয়-তৃষ্ণায় অধীর। আর বিষয়-তৃষ্ণায় আকুল অশান্তচিত্ত ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়? অসংযত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সদাসর্বদা বিষয়ভোগে বিচরণ করছে। প্রতিকূল বায়ু যেমন নৌকাকে অস্থির করে তোলে, তেমনই যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও অসংযত ব্যক্তির চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, তার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

অতএব হে মহাবাহো! ভক্তিযোগের মাধ্যমে যাঁর ইন্দ্রিয় বিষয় হতে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও সংযত হয়েছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এই রকম ব্যক্তি অধ্যাত্ম-ভাবনায় সদা জাগ্রত থাকেন, বিষয়-ভোগের ক্ষেত্রে তিনি নিদ্রিত থাকেন। আর বিষয়াসক্ত মানুষ পরমার্থ বিষয়ে সদা নিদ্রিত, কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে তারা জাগ্রত।

বিশ্লেষণ

যার ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নেই, সে জীবনের উদ্দেশ্য কি তা জানে না। বিষয় তৃষ্ণায় তার চিত্ত সর্বদা চঞ্চল। সে অশান্ত ও বিভ্রান্ত। জড়-জাগতিক দিক থেকে অনেক জ্ঞানী, বিদ্বান হলেও ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষ কেবল ইন্দ্রিয়ভোগের চেষ্টা করে, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে। কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় দমন করে সফল হওয়া যায় না। যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও মন যে কোন মুহূর্তে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। একমাত্র উপায় হচ্ছে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর ভগবানের সেবায়

নিয়োজিত করা। যাঁরা জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা ভগবৎ-সেবায় ব্রতী হন। কিন্তু বিষয়কামী মানুষের চিত্ত বিষয়ভোগ ব্যতীত আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না।

● স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি জড়-আসক্তি হতে মুক্ত

শ্লোক ৭০-৭২

হে অর্জুন! বিভিন্ন দিক দিয়ে বিপুল জলরাশি সব সময় সমুদ্রে প্রবেশ করছে, কিন্তু সমুদ্র তাতে বিক্ষুব্ধ হয় না, অচঞ্চলই থাকে। তেমনই, মনে অসংখ্য কামনার উদয় হলেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত বিচলিত হয় না, ভগবানে স্থির থাকে, তিনিই শান্তি লাভ করেন। যারা কামনা উদয় হওয়ামাত্র তা পূরণের জন্য অধীর হয়, তারা কখনও শান্তি পায় না।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি জড় বিষয়ে নিরাসক্ত, মমত্ববুদ্ধিশূন্য। তিনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে অহঙ্কারশূন্যভাবে বিচরণ করেন। তাঁর মন ভগবৎ-ভাবনায় পূর্ণ, বুদ্ধি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। একেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। হে পার্থ! যিনি এই স্তর লাভ করেন, তিনি আর মোহ-কবলিত হন না। জীবনের অবসানকালে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধাম লাভ করেন।

বিশ্লেষণ

বাসনা করা আত্মার স্বভাব। বাসনাকে বন্ধ করা বা মুছে ফেলা যায় না। আমাদের নিত্য স্থায়ী বাসনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কিন্তু আমরা অধঃপতিত হয়েছি, আর এই জড় পরিবেশে সেই ভগবৎ-সেবার বাসনা নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ বাসনায় পরিণত হয়েছে।

ভক্তিযোগ হচ্ছে বিষয়ভোগের বাসনাকে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের বাসনায় পরিবর্তিত করার পন্থা। এইভাবে এই জড় জগতেও ভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে সেবাকর্মে নিযুক্ত হলে, বুদ্ধি ও চেতনা পুনরায় অপ্রাকৃত, শুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। তখন জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিকৃত বাসনা আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়। যেমন অর্জুন প্রথমে নিজের বাসনা-তৃপ্তির জন্য যুদ্ধকরতে চাননি, কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ লাভের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।

কৃষ্ণভাবনাময় দিব্য জীবন যিনি লাভ করেন, তিনি সমস্ত জড় বাসনা হতে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-সেবার অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন হন। জড় দেহের অবসানে তিনি ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন, যেখানে কেউ কোন সম্পত্তিকে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করতে অভিলাষী নয়, বরং সব কিছুকেই পরম প্রীতিতে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে তাঁরা দিব্য আনন্দ লাভ করেন।

শব্দার্থ ঃ নিস্পৃহ — নিরাসক্ত, উদাসীন; দ্বেষ — বিরাগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সাংখ্য-যোগ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক ঃ

১

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

হে কৃষ্ণ! কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এখন আমি তোমার শিষ্য, সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে শিক্ষা দাও। — অর্জুন —শ্লোক ৭

২

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না। — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ —শ্লোক ১২

৩

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে রূপান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

—শ্লোক ১৩

৪

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

—শ্লোক ২০

৫

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (ধ্রুব সত্য) এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।

—শ্লোক ২৭

৬

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ (ভগবদ্ভক্তিজাত চিন্ময় আনন্দ) আস্বাদন করার ফলে, সেই বিষয়তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন।

—শ্লোক ৫৯

৭

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥

চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না; এইভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। —শ্লোক ৬৫

অনুশীলনী - ২

১। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করুন ঃ

- ☐ ক) জীবনের উৎস হচ্ছে জড় পদার্থের দীর্ঘকালীন রাসায়নিক বিক্রিয়া।
- ☐ খ) বিষয়কামী ব্যক্তি সর্বদাই অশান্ত।
- ☐ গ) ভোগ ও ঐশ্বর্যের বিলাসে যাদের বুদ্ধি মোহিত হয়েছে, তারা বেদের পুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্ট হয়।
- ☐ ঘ) চেতনার উৎস হচ্ছে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম অণুকণাসমূহ।
- ☐ ঙ) সমস্ত বেদের পরম জ্ঞাতব্য হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।
- ☐ চ) জীবদের আত্মা থাকলেও মৃত্যুর সাথে সাথে তা বিনষ্ট হয়।
- ☐ ছ) অর্জুন ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) যাঁর বুদ্ধি সমস্ত জড়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁকে বলা হয় ————।

খ) চেতনার চিন্ময় স্তরের স্থিতিকে বলা হয় ————।

গ) স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত দেহান্তে ———— প্রাপ্ত হন।

ঘ) বেদের কর্মকাণ্ডীয় বিধিবিধান জড়া প্রকৃতির ———— দ্বারা প্রভাবিত।

ঙ) যিনি বাইরে ইন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগ করে মনে মনে বিষয় চিন্তা করেন, তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ———— বলেছেন।

চ) জীবের দেহ পরিবর্তন হলেও ———— পরিবর্তন হয় না।

ছ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে ———— হচ্ছে বেদান্ত-দর্শনের সারমর্ম।

জ) ———— সমস্ত জীবের প্রতিপালক, সুহৃৎ ও সাক্ষী।

৩। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) যে ব্যক্তির কর্মের উদ্দেশ্য ভোগ-ঐশ্বর্য লাভ, সে ঃ

- [ ] অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান।
- [ ] সুখ লাভের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তববাদী।
- [ ] প্রকৃত পারমার্থিক বুদ্ধিশূন্য, কৃপণ।

খ) জড় দেহের অবসানে দেহস্থ আত্মা —

- [ ] আগুনে পুড়ে যায়।
- [ ] শূন্যে বিলীন হয়ে যায়।
- [ ] পঞ্চভূতে মিশে যায়।
- [ ] আর একটি দেহে স্থানান্তরিত হয়।

গ) সেই কর্মই নিষ্কাম কর্ম, যেখানে —

- [ ] কোন রকম ভোগবাসনা থাকে না।
- [ ] নিজের ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা থাকে।
- [ ] ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনা থাকে।
- [ ] পিতা-মাতা বা জাতির মঙ্গলের কামনা থাকে।

ঘ) একটি মানুষের মৃত্যুবরণ অর্থাৎ দেহত্যাগ করার পর, পরবর্তী দেহটি কেমন হবে তা নির্ভর করে ঃ

- [ ] তার পূর্বকৃত কর্ম এবং তার মৃত্যুকালীন চিন্তা ধারার উপর।
- [ ] তার নিজের ইচ্ছার উপর।
- [ ] তার পিতা-মাতার পুণ্যকর্মের উপর।
- [ ] বিভিন্ন দেব-দেবীর ইচ্ছার উপর।

ঙ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারটি আশ্রম— এই বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- [ ] সমাজে একটি শ্রেণীর আধিপত্য সৃষ্টি করা, যাতে তারা অন্যদেরকে বোকা বানিয়ে সুখভোগ করতে পারে।
- [ ] সমাজকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে রাখা।
- [ ] সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পারমার্থিক লক্ষ্যে পরিচালিত করা, যাতে সমাজের সকলে এমন কি নিম্নতম স্তরের মানুষও পরম স্বার্থ শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করতে পারে।

৪। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

ক) মৃত্যু বলতে কি বোঝায়?
খ) 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ কি?
গ) কচ্ছপের উদাহরণটি কি জন্য দেওয়া হয়েছে?
ঘ) জড় দেহের ছয়টি পরিবর্তন কি কি?
ঙ) সকাম কর্মের ফল কি?
চ) আত্মাকে দেখা যায় না, তা হলে কিভাবে আমরা তার অস্তিত্ব অনুভব করব?
ছ) ভগবান কাদেরকে মিথ্যাচারী বলে অভিহিত করেছেন? এবং কেন?
জ) দুটি পাখির দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে?
ঝ) অর্জুন কেন ভগবানের শিষ্যত্ব বরণ করলেন?
ঞ) কাদেরকে মায়াবাদী বলা হয়?
ট) 'জীব সর্বগত' — ব্যাখ্যা করুন।
ঠ) অল্প ধর্মানুশীলনও কেন মহাকল্যাণকর?
ড) গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে?
ঢ) ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?
ণ) কলিযুগে ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য একমাত্র নির্ধারিত পন্থা কি?
ত) আত্মা কেন দেহান্তরিত হয়? তাঁর পরবর্তী দেহ কেমন হবে তা কিভাবে নির্ধারিত হয়?

৫। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) কাদেরকে ভগবান 'কৃপণ' বলেছেন? এবং কেন?
খ) স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি?
গ) দেহ ও আত্মার পার্থক্য প্রদর্শন করুন।
ঘ) আত্মার কয়েকটি গুণবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
ঙ) বেদের কর্মকাণ্ডকে কেন ত্রিগুণময় বলা হয়েছে?
চ) জড় বিষয়ে আসক্ত হলে কিভাবে জড় অন্ধকূপে পতিত হতে হয় লিখুন।
ছ) কিভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়? দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে কি হয়?
জ) ইন্দ্রিয়ভোগী বিষয়কামী ব্যক্তির অবস্থা কেমন?
ঝ) কিভাবে জড় বিষয়াসক্তি মন থেকে নির্মূল করা যায়?
ঞ) ষড়ৈশ্বর্য কি কি? কোথায় কিভাবে সেগুলি দেখা যায়?
ট) আমরা কেন মৃতের জন্য শোক করি? কেন তা নিরর্থক?
ঠ) কেন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন? উদাহরণ সহযোগে লিখুন।

ড) প্রতিটি আত্মার স্বাতন্ত্র্য যে চিরকাল বর্তমান থাকে তা প্রমাণ করুন।

ঢ) বেদে বলা হয়েছে, 'কোন জীবের প্রতি হিংসা কোরো না', তা হলে শ্রীকৃষ্ণ কেন অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করছেন?

ণ) বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণের উদ্দেশ্য কি?

ত) অন্য সমস্ত কর্তব্য বর্জন করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হলে কি হয়?

থ) 'দেহাত্মবুদ্ধি' বলতে কি বোঝ? কিভাবে এই ভ্রান্ত বুদ্ধি দূর করা যায়?

দ) দিব্যজ্ঞান উদিত হলে কি হয়?

ধ) সমুদ্র ও কামের দৃষ্টান্তটি কি?

ন) ভগবদ্ভক্তিময় কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

প) এই অধ্যায়ের ৬টি শ্লোক মুখস্থ বলুন।